যুগান্তর

তারিখ 12 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম

সারা দেশে অবৈধ প্রতিষ্ঠান ৭০ হাজার

# অবৈধ কেজিং স্কুল বন্ধে ৫৫৯ টাস্কফোর্স

**মুসতাক আহমদ**

গ্রামগঞ্জে ও শহরের অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অবৈধ কিন্ডারগার্টেন (কেজি) স্কুল বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে ৫৫৯টি টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গঠিত এ টাস্কফোর্স লাগামহীনভাবে চলা এসব শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করবে। এরপর এগুলো বন্ধসহ সার্বিক করণীয় বিষয়ে সুপারিশ করবে। পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা করেও এসব স্কুলকে আইনের আওতায় আনতে না পেরে এমন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

টাস্কফোর্সগুলোর মধ্যে ৪৮৭ উপজেলায় একটি করে, ৬৪ জেলায় একটি করে এবং ৮ বিভাগে একটি করে হবে। তিন ধরনের টাস্কফোর্সের প্রত্যেকটিতে ৫ জন করে সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে কমিটি উপজেলায় থাকা কেজি স্কুল নিয়ে কাজ করবে। জেলা প্রশাসক করবেন তার জেলা শহরের ভেতরের বা উপজেলার বাইরে যা থাকবে। বিভাগীয় কমিশনারদের মহানগর বা মেট্রোপলিটন শহরের স্কুলের বিষয়ে কাজ দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত আদেশ দু'একদিনের মধ্যে জারি করা হবে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করে যুগান্তরকে বলেন, 'দেশে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত বেশির ভাগ কেজি স্কুল বৈধভাবে গড়ে ওঠেনি। এসব স্কুলের আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাও আমরা জানি

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বিকাশের মাধ্যমে টেলিটকের এয়ারটাইম রিচার্জ কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম

## কেজি স্কুল বন্ধে ৫৫৯ টাস্কফোর্স

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

না। তাই টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, এসব টাস্কফোর্স কেজি স্কুলগুলোর পরিসংখ্যান তৈরি করবে। এছাড়া এসব স্কুল কী পড়ায়, সরকারি বই পড়ায় কিনা, শিক্ষকদের যোগ্যতা কেমন, কী প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, কেমন বেতন ভাতা নেয়, কোন কোন খাতে অর্থ আদায় করে, স্কুল প্রতিষ্ঠার অর্থের উৎস কী, আয়ের অর্থ কোথায় ব্যয় হয়, ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবিধান মানে কিনা ইত্যাদি খোঁজখবর নেবে। এরপর তারা সুপারিশ করবে। মূলত এভিকশনের (উচ্ছেদ) আগে আইনি ভিত্তি প্রয়োজন। সেজন্যই এই টাস্কফোর্স। টাস্কফোর্সের সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে। তিনি আরও বলেন, যেখানে যে কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে, সেখানে সেটা রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, টাস্কফোর্সগুলো তাও সুপারিশ করবে। অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই বন্ধের ব্যবস্থা নেবে সরকার। মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) সূত্র জানিয়েছে, এ টাস্কফোর্স গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য স্কুলগুলোকে আইনের মধ্যে নিয়ে আসা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিকবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের আকার এবং স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোর তাগিদ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বইয়ের আকার ছোট করেছে। সরকারি স্কুলে বইয়ের বহরও কম। কিন্তু কেজি স্কুলগুলো লাগামহীনভাবে চলছে। কোনো কোনো বেসরকারি প্রকাশকদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে একশ্রেণীর স্কুল প্লে গ্রুপের শিশুর ওপরও বইয়ের অত্যাচার চালায়। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষক আছেন যাদের শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেরও নেই কোনো ব্যবস্থা। অনেক স্কুলের মালিক, তার স্ত্রী ও সন্তানরা মিলে স্কুল চালাচ্ছেন। অথচ আদায় করা হচ্ছে ইচ্ছামতো ফি। যদিও শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও দেয়া হয় নামমাত্র। এক কথায় রমরমা শিক্ষা বাণিজ্য চালাচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান। এমন সীমাহীন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬২ সালের স্কুল নিবন্ধন আইনের আলোকে ২০১১ সালে একটি বিধিমালা করে। কথা ছিল, কেজি স্কুলগুলো ওই বিধিমালার অধীনে স্কুল নিবন্ধন করবে। কিন্তু সার্বসাকুল্যে ৩০২টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করে। অথচ কেজি স্কুলের বিভিন্ন সমিতির তথ্যমতে, সারা দেশে এ ধরনের অন্তত ৭০ হাজার স্কুল আছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করলেও এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ডিপিইর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, ২০১১ সালে বেসরকারি প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালায় অবশ্য প্রয়োগগত সমস্যা ছিল।

এতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রাথমিক অনুমতিদানের শর্তে বলা আছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুমতিদানের আবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় উপপরিচালক প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং আবেদন পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে মতামতসহ কাগজপত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পাঠাবেন। এ সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত মূল্যায়ন কমিটি কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে এক বছরের অনুমতি দেবে। তারপর তিন বছরের অস্থায়ী নিবন্ধন এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে নিবন্ধন সনদ দেয়ার কথা। ওই কর্মকর্তা বলেন, এ শর্তটির কারণেই থমকে যায় কেজি স্কুলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া। কেননা ডিপিইর সাত বিভাগে সাতজন বিভাগীয় উপপরিচালক রয়েছেন। তারা যদি সব কাজ বাদ দিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শন শুরু করেন এবং দিনে একটি করে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন তাহলে বছরে পরিদর্শন হবে ২৬০টি প্রতিষ্ঠান। সাত বিভাগে এক বছরে পরিদর্শন হবে এক হাজার ৮২০টি প্রতিষ্ঠান। এভাবে ৭০ হাজার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে সময় লাগবে প্রায় ৩৮ বছর! এ অবাস্তব নির্দেশনা আর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। যে কারণে টাস্কফোর্স করে এখন প্রতিষ্ঠান শুমারির পাশাপাশি কেজি স্কুলগুলোকে লাইনে আনার চেষ্টা শুরু হচ্ছে।

ডিপিই মহাপরিচালক যুগান্তরকে বলেন, আমরা অবৈধ এসব স্কুলের মধ্যে অবশ্যই অপ্রয়োজনীয়গুলো বন্ধ করে দেব। আর যেগুলো প্রয়োজনীয়, তাদের শোকজ করা হবে। তারা যদি শোকজের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে এবং আইন মেনে চলার অঙ্গীকার করে তাহলে হয়তো সরকার তাদের বিষয়টি ভেবে দেখবে।

২০১১ সালের বিধিমালায় ওই কেজি স্কুল পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, টিউশন ফি নির্ধারণ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষক-কর্মচারীদের যোগ্যতা ও নিয়োগ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, তহবিল পরিচালনা, বিদ্যালয়ের ভূমির পরিমাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়। এতে সংরক্ষিত তহবিল, নিবন্ধন ফি, অস্থায়ী নিবন্ধন ফি, প্রাথমিক আবেদন ফি ইত্যাদিও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ওই প্রজ্ঞাপন জারির ঠিক এক বছরের মাথায় সেই ফির হার প্রায় অর্ধেক কমিয়ে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অর্থাৎ একটি বিদ্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল মহানগর এলাকার জন্য যেখানে এক লাখ টাকা ছিল সেখানে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। কেজি স্কুলের মালিকদের চাপে সরকার এ সংশোধনী আনতে বাধ্য হয়। তারপরও এসব স্কুলকে সরকার আইনের মধ্যে আনতে পারেনি। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, সরকারের লক্ষ্য দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের বাইরে থাকবে না। জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশনাও তাই। যেহেতু এক দফায় উদ্যোগ নিয়ে সফল হওয়া যায়নি। তাই এবার সরকারের সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃত চিত্র তুলে আনার পাশাপাশি উপজেলা, জেলা ও বিভাগওয়ারি সুপারিশও আনা হচ্ছে। এখন আমরা নিরূপণ করব, যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। প্রয়োজন থাকলে তা কার্যকর থাকবে।